Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-I, published on January 2023, Page No. 33 –46
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

মতুয়াধর্মের উত্তরণে মূলধারার বৈষ্ণব ধর্মীয় প্রভাব

অসীম বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ, সুবর্ণরেখা মহাবিদ্যালয়
ইমেইল : sriashim.biswas@gmail.com

Keyword
Matua, Gaudiya Vaishnavism, Namasudras, Sect, Harichand - Guruchand Thakur, Matua mahasangha, Matua Darshan, Kirtan, Chanting, Congressional, Haribole

Abstract
Matua is a sect of depressed class of AVARNA Hindus who are Namasudras, a Schedule Caste group. The Movement was launched as a reformation by the followers of SriSri Harichand Thakur. Thakur attained atmadarshan at an early age and would subsequently preach his Darshan in Twelve Commandments. The teaching of Harichand Thakur established education as preceminently important for the adherent and the upliftment of the population the adherents duty, while also providing a formula for ending social conflict. Matua Mahasangha believe in Swayam-Dikshiti (self-realization) through the chanting of Harinaam, i e, chanting the Holy name of God Hari. Harichand stressed the congressional chanting of Lord's name Kirtan of the sole means to Mukti. His followers in 19th century were enchanted by congressional chanting of Lord Hari, which Bengali called 'hariname matoara' giving the sect current name 'Matua'. So anyone who has faith in the Darshan or Philosophy of God Harichand belongs to the Matua-mahasangha. Gaudiya Vaishnavism had immense influence on this sect. I have tried to discuss the influence of Gaudiya Vaishnavism on the Matua Sect of Bengal in my research paper.

Discussion
বাংলার আদি অধিবাসীদের মধ্যে নমঃশূদ্ররা সংখ্যার বিচারে বৃহত্তম ছিল। প্রাচীন বঙ্গদেশে নমঃশূদ্ররা 'চন্ডাল' নামে পরিচিত ছিল। অষ্টম শতকের পূর্বে বাংলায় অব্রাহ্মণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাদের সংখ্যা বহু হলেও চন্ডাল জাতি হিসেবে হিন্দু চতুর্বর্ণের বাইরে অবস্থান ছিল তাদের। ঔপনিবেশিক শাসনকালে জনগণনার সময় সেন্সাস কমিশনার ই.এ. গেইট নমঃশূদ্রদের সম্পর্কে বলেছেন, নমঃশূদ্র অথবা চন্ডালরা পূর্ববঙ্গের বৃহত্তম জনজাতি। উনিশ শতকের শেষে নমঃশূদ্ররা পূর্ববঙ্গে হিন্দু সমাজের বৃহত্তর এবং যুক্তবঙ্গে মাহিষ্যদের পরে অর্থাৎ দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি ছিল।

> "আবার ১৯১১ সালের জনগণনার হিসাব অনুসারে পূর্ববঙ্গের মোট হিন্দুদের মধ্যে নমঃশূদ্ররা ছিল ১৭.৫৬ শতাংশ।"[১]

১৯৩১ সালে ছিল **১৮.৯৪** শতাংশ। অর্থাৎ হিন্দুদের একটি বৃহত্তর অংশ ছিল নমঃশূদ্র সমাজের মানুষ। যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, বাকরগঞ্জ, ঢাকা, ময়মনসিংহ এই ছ'টি জেলায় মোট নমঃশূদ্রদের অর্ধেকের বেশি অংশ বসবাস করত। ফরিদপুর জেলায় তাদের সংখ্যা সর্বাধিক, বাংলার এক পঞ্চমাংশ নমঃশূদ্ররা এই জেলায় বসবাস করত।

> "পেশা ও বৃত্তিগত কারণে নমঃশূদ্ররা ভিন্ন ভিন্ন শাখা-উপশাখা বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। যেমন- হালিয়া বা হালবাহী (ভূমি চাষে নিযুক্ত), ঘাসি (ঘাস কাটার সঙ্গে যুক্ত), কাম্বো (পাল্কিবাহক), করাল (মাছ বিক্রেতা), ভাগ্নল (ভ্রাম্যমান বিক্রেতা), করাতিয়া (কাঠমিস্ত্রি), নুনিয়া (লবণ প্রস্তুতকারী), জালিয়া (মৎস্যজীবী), শিউলী(খেজুর ও তালগাছ কেটে রস প্রস্তুতকারী), ধানী(ধান থেকে চাল প্রস্তুতকারী) ইত্যাদি।"[২]

১৯০১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে দেখা যায়, নমঃশূদ্রদের ৬৪.৯০ শতাংশ এবং **১৯১১** সালে ৬৬.৭৫ শতাংশ মানুষ পরনির্ভরশীল ছিল। তবে **১৯০১** সালে ৪৬০০ জন এবং **১৯১১** সালে ৫৪৩২ জন নমঃশূদ্রদের খাজনা দিতে দেখা যায়।

> "**১৯১১** সালের সেন্সাসে নমঃশূদ্রদের মধ্যে ৭০ জন শিক্ষক, ৪৯৯ জন চিকিৎসক হিসাবে পেশাগ্রহণ করতে দেখা যায়।"[৩]

এবং তাদের অন্যান্য পেশা হিসেবে ব্যবসায়ী, বণিক, কেরাণি, মিস্ত্রি, মোক্তার, পোস্ট অফিসে বিভিন্ন চাকরির উল্লেখ করা হয়।

বাংলায় বসবাসকারী হিন্দু সমাজের বৃহত্তর অংশ জুড়ে থাকা নমশূদ্ররা বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে চন্ডাল, চাঁড়াল, চাঙ প্রভৃতি নামে অনিশ্চিত এবং অস্থায়ী পেশায় নিযুক্ত ছিল, যদিও অধিকাংশই কৃষিকাজ ও নৌকা চালনার কাজে যুক্ত ছিল। নমঃশূদ্রদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দেখতে পাওয়া যায়। গৌড়ের ইতিহাসে দেখা যায় যে, পাল ও সেন রাজাদের রাজত্বকালে অনেক হিন্দুই বৌদ্ধ হয়।

> "ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃপ্রচারণ হলে পুনরায় অনেকে হিন্দু সমাজে গৃহীত হন- নমঃশূদ্র জাতি তাদের মধ্যে অন্যতম।"[৪]

আবার 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে'র মতে ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচির সন্তান কাশ্যপ, কাশ্যপের কুলোদ্ভব নমঃশূদ্র। অর্থাৎ নমঃশূদ্র সমাজের গোত্র কাশ্যপ। এইরকম নানাবিধ মত প্রচলিত আছে নমঃশূদ্রদের সম্পর্কে। প্রাচীনকাল থেকে বঙ্গদেশ ছিল ছোট ছোট কৌম বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত। ধর্মকর্মের দিক দিয়ে এবং জাতি-বর্ণ সংস্কার ও ব্যবহারিক জীবন প্রভৃতি বিভিন্নতার কারণে কৌমভেদে ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক রীতিনীতি এবং পূজা অনুষ্ঠানের ভিন্নতা বর্তমান ছিল। বিভিন্ন কৌমের ভক্তি, বিশ্বাস-পূজাচারের পশ্চাতে বহুদিনের পুরনো ধ্যান-ধারণা, অভ্যাস ও সংস্কার সমাজের ভেতরে ও বাইরে সমসাময়িক সমাজচেতনা ও সমাজভাবনা অনুযায়ী সামাজিক শ্রেণি ও স্তরভেদে আত্মগোপন করে থাকে।

> "আবার এই ধর্মীয় বিশ্বাস, সংস্কার, আচার-আচরণ দীর্ঘদিন একই কৌমের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে কৌমের স্তর উপস্তরের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে অনবরতই নতুন নতুন ধ্যান-ধারণা, ভক্তি, বিশ্বাস ও ধর্মকর্ম, আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনের আচার-উপাচার প্রভৃতি সৃষ্টি করে।"[৫]

মুসলমান শাসনকালে শাসকশ্রেণির কাছ থেকে আনুকূল্য লাভের উদ্দেশ্য ছাড়াও ব্রাহ্মণ্যবাদের বর্ণপ্রথার বিপরীতে ইসলাম ধর্মের উদারনীতির প্রতি একটা স্বাভাবিক সামাজিক আকর্ষণ ছিল।

> "সুতরাং একই সাথে নিম্নশ্রেণির বিরাট সংখ্যক জনগোষ্ঠীর কাছে ধর্মীয় সামাজিক সাম্যের আদর্শের সাথে সাথে তাৎক্ষণিক পার্থিব লাভের উজ্জ্বল সম্ভাবনা ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তর অনিবার্য করে তুলেছিল।"[৬]

ব্রাহ্মণ্যবাদী সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার তাগিদে রঘুনন্দন রচিত শাস্ত্রীয় গ্রন্থ ও অন্যান্য স্মৃতিশাস্ত্র সম্মত সামাজিক রীতিনীতি মুসলিমদের কাছ থেকে ব্রাহ্মণদের বিচ্ছিন্নকরণের সাথে সাথে হিন্দু ধর্মের অন্যান্য নিম্নবর্ণের মানুষকেও দূরে সরিয়ে

দিয়েছিল। এইভাবে ব্রাহ্মণরা নিজেদের চারপাশে তৈরি প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের দেওয়াল ঘেরা আত্মকেন্দ্রিক জীবন যাপন করতে চেয়েছিল। নিজস্ব সীমাবদ্ধতার মাঝে ব্রাহ্মণ্যবাদ বুদ্ধিবৃত্তিগত কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছিল। আবার নব্যন্যায় চর্চা ধর্মীয় জ্ঞানের দুর্বোধ্য দর্শন সাধারণ মানুষের বোধগম্য ছিল না।

> “ফলে এই বিশুদ্ধ বুদ্ধিবাদের প্রতি নিম্নশ্রেণির মধ্যে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়।”[৭]

খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে বাংলায় শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিবাদী বৈষ্ণব আন্দোলনের ‘ভক্তি-প্রেম-তত্ত্বে’ সমাজের সমস্ত শ্রেণির মানুষকে প্রভাবিত করেছিল। ভক্তি ছিল চৈতন্য ধর্মান্দোলনের মূল দর্শন। ভাগবত পুরাণের ভক্তি বিষয়ক শ্লোক সমূহের বিশিষ্ট সংকলন 'ভক্তি রত্নাবলী' সংকলন করেন চৈতন্যের সমসাময়িক কালে বিষ্ণুপুরী নামক সন্ন্যাসী, সেখানে ভক্তিহীন ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণতার কোনো স্থান নেই। এখানে বলা হয় ভক্তি এক বিশেষ জীবন দর্শন ও জীবনধারা যাতে স্বার্থপরতা, লোভ, মোহ, সম্মান প্রাপ্তির জন্য প্রতিযোগিতা ও সম্মান না পেলে হাহাকার স্থান পায় না।

> “ভক্তিতে হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার ও দুর্নীতির কোনো স্থান নেই।”[৮]

ভক্তিতে জাতপাতের বিচার নেই।

> “শ্বাপদ, কুকুরের মাংসভোজী চন্ডাল, যদি কৃষ্ণকে তার জীবন বাক্য বাসনা সমূহ এবং ধন-সম্পদ নিবেদন করে সে দ্বাদশ গুনসম্পন্ন ব্রাহ্মণের চেয়েও বরিষ্ঠ।”[৯]

অর্থাৎ অচ্ছুৎ, দরিদ্র, অনাদৃত এবং প্রান্তিক হলেও ভক্তিবাদী বৈষ্ণব ধর্মের আঙিনায় ভক্তগণ সমমর্যাদার অধিকারী। চৈতন্য প্রবর্তিত নাম-সংকীর্তন, নগর পরিক্রমা এবং পংক্তি ভজনানুষ্ঠানে সকল ভক্তগণ অংশগ্রহণ করতে পারত। চৈতন্যের ভক্তিবাদী ভাবসাধনায় বঞ্চিত জনসাধারণ ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট হয় এবং বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, ষোড়শ শতকের এই প্রেক্ষাপটে অসংখ্য পরিমাণে নিম্নবর্ণের দরিদ্র নমঃশূদ্র শ্রেণি বৈষ্ণব ধর্মের পতাকাতলে আসে। এর ফলে মূলধারার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম জনশক্তিতে বলিয়ান হয়ে ওঠে। বাংলায় প্রভূত অঞ্চলে তাদের সমর্থক বৃদ্ধি পায়। বহু নিম্নশ্রেণির বৈষ্ণব গুরুর আবির্ভাব ঘটে। বাংলার চন্ডাল জাতির লোকেরা অন্যান্য নিম্নবর্ণের মতোই বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতার সূত্র খুঁজে পায়। চৈতন্যদেবের উদাত্ত আহ্বান 'চন্ডালোপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠ, হরিভক্তি পরায়ণ', নিম্নশ্রেণির মধ্যে একদিকে ধর্মীয় ভক্তি ভাবনায় অধিকার অর্জন করে, অন্যদিকে দ্বিজ জাতির সমান অথবা দ্বিজদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান পাবার বাসনা জাগরিত হয়। চৈতন্য সহচর নিত্যানন্দ জাত বিচার মানতেন না, ঢাকা শহরে নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার করেন। অদ্বৈত আচার্যের শিষ্য ঈশান নাগর মানিকগঞ্জে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে যান।

> “চৈতন্যের এক মাতুল ফরিদপুরের মুখডোবা গ্রামে 'বিষ্ণুদাস ঠাকুর' নামে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন”।[১০]

যশোর ও খুলনাতে সনাতন রূপ গোস্বামী বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন।

> “তাঁরা যশোরের চেঙ্গুটিয়া গ্রামে কিছুকাল বসবাস করেছিলেন।”[১১]

অন্যদিকে যশোরের ভাটপাড়া কলাগাছি গ্রামের যবন হরিদাসের জন্মস্থান ছিল। বাংলার বারভুঁইয়াদের মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী প্রতাপাদিত্য রায় শাক্ত ধর্মের অনুসারী হলেও তাঁর কাকা বসন্ত রায় বৈষ্ণব ছিলেন।

> “মহম্মদপুরের রাজা সীতারাম রায় বৈষ্ণব ছিলেন।”[১২]

এই উভয়ে রাজার ঢালী বা লাঠিয়ালদের অনেকেই ছিল নমঃশূদ্র। ধর্মীয়, সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে রাজশক্তির অনুষঙ্গের কারণে নিম্নবর্ণের জাতি বিশেষত নমঃশূদ্রদের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের বিস্তার ঘটে।

> “বৈষ্ণব ধর্মদর্শনে ব্রাহ্মণ্যবাদের সমালোচনা করায়, প্রথমদিকে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণগণ বৈষ্ণব ধর্মের বিরোধী ছিল।”[১৩]

পরবর্তীকালে তারা সম্ভ্রান্ত উচু বংশের জমিদার এবং হোসেনশাহী শাসকদের সহানুভূতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। সুতরাং ষোড়শ শতকে বৈষ্ণব ধর্ম বিস্তারের ক্ষেত্রে যোগ্য পরিমণ্ডল প্রস্তুত হয়েছিল।

> “এর ফলে নিম্নবর্ণের অসংখ্য নমঃশূদ্র শ্রেণির মানুষ মূলধারার গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের পতাকাতলে শরণাপন্ন হয়।”[১৪]

বাংলার সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর চৈতন্যবাদের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। আবেগ, ভক্তি, ধর্মোপাসনার উপর তাঁর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম পরবর্তীকালে যা বাংলায় ঐশ্বর্যশালী সাহিত্য ও সংস্কৃতির সৃষ্টি করেছিল। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব সাহিত্য সংক্রান্ত আবেগ, ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল লোকের কাছে উন্মুক্ত ছিল, এই সার্বজনীন মনোভাব গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদের মূলনীতির প্রবলভাবে বিপরীতধর্মী।

> "সমসময়কালে এটা ছিল গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিপ্লব।"[১৫]

কিন্তু চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর বৈষ্ণব ধর্মের প্রেমভক্তির তত্ত্ব ধর্মের অঙ্গনে জাতপাতহীনতা এবং সকল শ্রেণির বৈষ্ণব ভক্ত ও শিষ্যের সমমর্যাদায় গ্রহণ করার বিষয়টি বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। চৈতন্যদেবের ভক্তি ও ধর্মের দিক দিয়ে সকলকে একই আঙিনায় আনতে চেষ্টা করলেও জাতিভেদ প্রথাকে ভেঙে ফেলতে চাননি। তাছাড়া তাঁর সময়ে ৪৯০ জন প্রত্যক্ষ পরিকরের মধ্যে ২৩৯ জনই ছিল ব্রাহ্মণ, ৩৭ জন বৈদ্য, ২৯ জন কায়স্থ, ২ জন মুসলমান এবং ১৬ জন স্ত্রীলোক। পরবর্তীকালে শূদ্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও উচ্চবর্ণের আধিপত্য ছিল চোখে পড়ার মতো। সপ্তদশ শতকের এবং আঠারো শতকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে বর্ণবাদী রীতিনীতি অনুপ্রবেশ ঘটে, গোঁড়া বৈষ্ণব গুরুগণ তাদের প্রভাব বিস্তারের জন্য নিজস্ব জাতিকুলের মর্যাদা ও বর্ণ চরিত্রকে ভক্ত ও শিষ্যদের নিকট আত্ম-পরিচিতি হিসাবে তুলে ধরেন। আত্মপরিচয়ের স্বাতন্ত্রীকরণের মধ্য দিয়ে গুরুগণ উঁচু জাতের গৌড়ীয় বৈষ্ণব এবং তথাকথিত নিচু জাতের বৈষ্ণব হিসেবে- জাত-বৈষ্ণব এই দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

> "বস্তুত এই জাতবৈষ্ণবদের সম্বন্ধে এমন সব ধারণা বা ভাবমূর্তি তৈরি হয়, যার সঙ্গে মিশে ছিল একাধিক জাতিগত শুচি-অশুচিতার সম্বন্ধ, অন্যদিকে ধর্মীয় সংস্কারের ফলে ধর্মান্তরিত নিচু জাতের বৈষ্ণবরা গোঁড়াপন্থী গোস্বামী বা মূলধারার প্রাতিষ্ঠানিক গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল।"[১৬]

রক্ষণশীল গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারা ক্রমশ সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার মাধ্যমে 'নব্য ব্রাহ্মণ্য বৈষ্ণব' মতবাদে রূপান্তরিত হলো, যার সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যবাদী পৌরাণিক হিন্দুধর্মের কোনো পার্থক্য রইল না। ফলে চৈতন্যোত্তরর বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে পূর্বেকার গণভিত্তিক ভক্তি আন্দোলনের গতিরুদ্ধ হয়ে যায়। জাতবৈষ্ণব সম্প্রদায় আবার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গুরুদের কেন্দ্র করে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

> "সতেরো শতক থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত বাংলায় বৈষ্ণব ভক্তিবাদী অন্তর্নিহিত 'উদ্বারণ তত্ত্ব' তৃণমূলের নিম্নস্তরের মানুষের মধ্যে বহু গুরুবাদী গৌণসম্প্রদায় রূপে ছড়িয়ে পড়েছিল, অন্যদিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব বা মূলধারার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম সংস্কৃত ভাষার তাত্ত্বিক ও বিদগ্ধ উচ্চারণের ফলে উচ্চ-মধ্যবিত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল।"[১৭]

পরবর্তীকালে উনিশ শতকে মূলধারার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের নানা পট পরিবর্তন হয়। বিভিন্ন বৈষ্ণব সাম্প্রদায়গুলির মধ্যে বৌদ্ধ সহজিয়া, তান্ত্রিক ও নাথপন্থী আচার ব্যবহারের সঙ্গে সুফি দরবেশদের সমন্বয়বাদী ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটে। অন্যদিকে ব্রাহ্মণবাদী হিন্দুধর্মের অভ্যন্তরে প্রাচীন কুলীন প্রথা, বাল্যবিবাহ, সতীদাহ, বহুবিবাহ, অস্পৃশ্যজনিত 'জলচল'- 'জলঅচল' প্রভৃতি ভেদ ও বৈষম্য সমাজদেহের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করেছিল। উচ্চবর্ণের সমাজ ব্রাহ্মণ্যবাদী রীতিনীতি ও কুসংস্কারের প্রভাবে অসাঢ় ক্রিয়া-কলাপে আত্মমগ্ন হয়ে পড়ে। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথম থেকেই উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজের সংস্কারের প্রয়োজনে রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর প্রমুখের মতো সমাজ সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু নিম্নবর্ণের ধর্মীয় সামাজিক সমস্যা, জাতিভেদ প্রথার বৈষম্য, বঞ্চনা ও অবিচারের দিকগুলির অবসান কল্পে সুস্পষ্ট কোনো পরিকল্পনা দেখা যায় না। উনিশ শতকের নবজাগরণ পাশ্চাত্য উদারনৈতিক ভাবধারায় হিন্দু সমাজের ব্যাপক সংস্কারের মাধ্যমে আধুনিক যুক্তিবাদী চিন্তাভাবনা মধ্যযুগীয় সামাজিক রীতিনীতিকে সুচিন্তিতভাবে আঘাত হানে।

> "প্রায় অচল স্তর বিন্যস্ত পিরামিডের ন্যায় স্তরায়িত সমাজের ভেতরে দেখা গেল নতুন সচল স্তরায়ন।"[১৮]

কিন্তু এই তথাকথিত নবজাগরণ কলকাতা কেন্দ্রিক অভিজাত সমাজে সীমাবদ্ধ থেকে যায়, গ্রাম বাংলার নিম্নবর্ণের সমাজে নবজাগরণের আলোক শিখা পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়। সনাতন হিন্দুধর্মের সামাজিক সংগঠনটি যে বর্ণভেদ, নিম্নবর্ণের ক্রমোচ্চ অসাম্যতা, শিক্ষা-সংস্কৃতি বৈষম্য, আধুনিক শিক্ষা দীক্ষা, যন্ত্রোন্নয়ন-শিল্পোন্নয়নের সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রেও

Trisangam International Refereed Journal (tirj)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-3, Issue-I, January2023, tirj/January23/article-4
Website: www.tirj.org.in, Page No. 33-46

অসাম্য, বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। ফলে পুরাতন চিরায়ত সামাজিক প্রথা অনুসারেই নিম্নবর্ণের গ্রামাঞ্চলের মানুষেরা পতিতই থেকে যায়।

> "পূর্ববঙ্গের যশোর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলার গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী তথাকথিত চন্ডাল বা নমঃশূদ্র জাতির লোকেরা সমাজের নিচু তলায় শিক্ষাহীন, কৃষিকাজ, মাছ ধরা, কৃষি শ্রমিক হিসাবে জীবিকা নির্বাহ করতে থাকে।"[১৯]

ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক ধর্মীয়-সামাজিক রীতিনীতি দ্বারা হীন মর্যাদায় তাদের জীবন অতিবাহিত হয়। জাতবৈষ্ণব ধর্মীয় গুরুদেব দীক্ষা গ্রহণ করে, তাদের ধর্মীয় অবস্থানও উচ্চবর্ণের বৈষ্ণব ধর্মীয় গুরুদের দ্বারা ঘৃণিত হয়। এই সময়ে পূর্ববঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের যে গুরুবাদী সম্প্রদায়গুলি প্রচলিত ছিল তারা আদর্শহীন গৃহধর্ম ত্যাগ করে নিকৃষ্টকর্মে লিপ্ত থাকত। ধর্মের কতকগুলি বাহ্যিক আচার-আচরণ, ফোটাকাঁটা, তিলক-চন্দন, তুলসী পাতা অঙ্গে ধারণ করা, মালাজপ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রীতি পালনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গুরুগণ তাদের ধর্মীয় জীবনকে আবদ্ধ রেখেছিল, যেগুলি মানুষকে আত্মমর্যাদাহীন করে সর্বপ্রকার নৈতিক-অধগতির পথ প্রশস্ত করেছিল। মূলধারার বাইরে গড়ে ওঠা বিভিন্ন গৌণ বৈষ্ণব ধর্মীয় গুরু ও সমার্থক ব্রাহ্মণ গুরুদের প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়গুলি দ্বারা পালিত কুসংস্কার, আচার সর্বস্বতা, যৌনসঙ্গ প্রভৃতি কারণে সমাজদেহ জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে। নমঃশূদ্র তথা অন্যান্য নিম্নশ্রেণির দলিত অতীত মানুষের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থান চৈতন্য পূর্ববর্তী অবস্থায় ন্যায় হীন ও অমর্যাদার আকার ধারণ করে।

উনিশ শতকের শুরুতে তাই, এই নিম্নশ্রেণির পতিত ও দলিত মানুষের জীবনে আলোক দিশা দেখাতে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে। যিনি দলিত নমঃশূদ্র সম্প্রদায় বা লোকায়ত ধর্ম মতবাদ মতুয়াদের পরিত্রাতা হয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। ঐতিহাসিক দিক দিয়ে এই ধর্মীয় সামাজিক পটভূমিতে পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার সফলাডাঙ্গা গ্রামের সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত নমঃশূদ্র বৈষ্ণব যশোবন্ত ঠাকুর ও অন্নপূর্ণা দেবীর দ্বিতীয় পুত্ররূপে **১৮১২** সালের **১১** মার্চ হরিচাঁদ ঠাকুরের (**১৮১২-১৮৭৮**) জন্ম হয়। যশোবন্ত ঠাকুরের অন্য চার পুত্ররা ছিলেন- কৃষ্ণদাস, বৈষ্ণব দাস, গৌরী দাস এবং স্বরূপ দাস।

> "হরিচাঁদ ঠাকুরের দুই পুত্র- গুরুচাঁদ ঠাকুর এবং উমাচরণ ঠাকুর।"[২০]

হরিচাঁদ ঠাকুরের পিতা যশোবন্ত এবং পিতামহ মুকুন্দরাম নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন এবং কঠোরভাবে বৈষ্ণব ধর্মীয় আচার-আচরণ পালন করতেন, কিন্তু হরিচাঁদ ঠাকুর বাল্যকাল থেকেই বৈষ্ণব ধর্মীয় গুরুবাদ, খুঁটিনাটি, অনাচার, বৈষ্ণব সেবার নামে জাত বিচার- এগুলিকে ভালো চোখে দেখতেন না। তবে হরিভক্তি, হরিনাম সংকীর্তন তাঁর হৃদয়গ্রাহ্য ছিল এবং হরিভক্তিপরায়ণ সাধু ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রায়ই তিনি ধর্মীয় আলোচনায় নিবিষ্ট থাকতেন, কীর্তনে যোগ দিতেন। ধীরে ধীরে হরিচাঁদ ঠাকুর তাঁর কীর্তনসঙ্গী ওড়াকান্দির নবকুমার রায়, বলাইচাঁদ, গোবিন্দ বিশ্বাস প্রমুখ ব্যক্তিদের নিয়ে একটি 'কীর্তন দল' গঠন করেন এবং ওড়াকান্দি, মল্লকান্দি, ঘৃতকান্দি, রাউৎখামার প্রভৃতি গ্রামে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের কীর্তন দল হরিনাম সংকীর্তন ও ভক্তিপ্রেমে মত্ত হয়ে ঈশ্বর সাধনার সহজ সরল মতবাদ ও পথ স্বল্প সময়ে স্থানীয় নমঃশূদ্রদের আকৃষ্ট করে। তাঁর কথায় ও কর্মে ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক রীতিনীতি বর্জন, জাতিবাদকে পরিহার করা এবং সংকীর্ণ বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিবাদ, তাঁকে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

হরিচাঁদ ঠাকুরের অনুগামী ভক্ত সম্প্রদায় 'মতুয়া' নামে পরিচিতি অর্জন করে। কীর্তনরত হরিভক্তগণ 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলে নৃত্যরত অবস্থায় উন্মত্ত হতেন, কখনো কখনো চেতনা শুন্য অবস্থায় সংজ্ঞাহীন হতেন। যা অমতুয়া সাধারণ ব্যক্তির কাছে 'পাগলামির নামান্তর' ছিল।

> "ব্যঙ্গ ও ঘৃণা দৃষ্টিতে বৈষ্ণব গুরুগণ ও উচ্চবর্ণের লোকেরা এদের 'মতো' বা 'মোতো' বলে উপহাস করতেন। উপহাস বা ঘৃণার বিষয়ে জানার পরেও হরিচাঁদ ঠাকুর 'মতুয়া' নামকরণকেই নিজ সম্প্রদায়ের আত্মপরিচিতির স্বীকৃতি দেন।"[২১]

হরিচাঁদ ঠাকুরের বয়স যখন **৩৫** বছর অর্থাৎ **১৮৪৬-৪৭** সাল নাগাদ কোনো এক সময় রাউৎখামার গ্রামের এক ভক্তের বাড়িতে 'আত্মদর্শন' বা তাঁর ঐশী শক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং তাঁর ভগবৎ শক্তি ও মহিমার কথা বিশেষভাবে প্রচার লাভ করে। এই সময় হরিচাঁদ ঠাকুরের জনপ্রিয়তা দুটি কারণে বৃদ্ধি পায়। প্রথমত, হরিচাঁদ ঠাকুর কীর্তনের সময়

কোনোরকম জাতবিচার করতেন না, সকলের সমানভাবে কীর্তনে অংশগ্রহণের অধিকার দান করেন। দ্বিতীয় কারণ, তিনি বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষের সার্বিক উন্নয়নের দিকগুলি তুলে ধরেন। রোগব্যধি গ্রস্ত মানুষের নিরাময়, জরাজীর্ণ, পতিত মানুষের পরিত্রাণ, কর্মের মাধ্যমে পার্থিব শক্তিবৃদ্ধি ও ভক্তির মাধ্যমে আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবৃত্তি করতে সঠিক পথের সন্ধান দেন। মানুষ তাঁকে বিশ্বাস করত এবং তাঁর মুখের কথা মেনে চলত। রোগ, ব্যাধি মুক্তিতে বেশির ভাগ সময় সুফল পাওয়ার কারণে তাঁকে 'ভগবান' বা ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ জ্ঞানে ভক্তি করত। হরিচাঁদ ঠাকুর নির্দেশিত 'হাতে কাম মুখে নাম', 'সত্য কথা বলা' পরস্ত্রীকে মাতৃজ্ঞানে দেখা, গার্হস্থ্য পবিত্র ধর্ম পালন করা, মানুষের সেবা করা, জাতিভেদ পরিহার করা, আত্মসংযম রক্ষা করা, পরধর্মকে শ্রদ্ধা করা- প্রভৃতি মতাদর্শের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা 'মতুয়া ধর্ম দর্শন' তাঁর অনুগামীদের প্রচারের ফলে পূর্ববঙ্গের নিম্নবর্ণের মধ্যে বিশেষত, নমঃশূদ্রদের মধ্যে 'মতুয়া ধর্মীয় সম্প্রদায়' গুরুত্বপূর্ণ ভাবে প্রতিষ্ঠা পায়। ১৮৭৮ সালে হরিচাঁদ ঠাকুরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরের (১৮৪৭-১৯৩৭) চেষ্টায় 'মতুয়া ধর্মীয়' সম্প্রদায়ের ধর্মীয়, সামাজিক, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক সংস্কার ও উন্নয়নের পরিকল্পনা বহুমুখী আকার নেয়। এই সময় 'মতুয়া' ধর্মীয় সম্প্রদায় তাদের স্বতন্ত্র আত্মপরিচিতি ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলের নমঃশূদ্র ও নিম্নবর্ণের জাতিগুলি চরমভাবে ধর্মীয় ও সামাজিক দিক দিয়ে ঘৃণিত, অবহেলিত এবং বর্ণহিন্দু জমিদার মহাজনদের দ্বারা নির্মমভাবে শোষিত হচ্ছিল। একদিকে পুরোহিততন্ত্রের অমর্যাদা, ঘৃণা ও শোষণের হাত থেকে এবং অন্যদিকে ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরের হাত থেকে নমঃশূদ্র নিম্নবর্ণের মানুষদের রক্ষা করতে ও তাদের পরিত্রাণের জন্য আত্মজাগরণ ও আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ ঠাকুর মতুয়া ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনকে যুগোপযোগী করে তোলেন। মতুয়া ধর্মের সমস্ত উৎস, রীতিনীতি, সাধনতত্ত্ব সমস্ত কিছুই তারক গোঁসাইয়ের 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' থেকে জানা যায়। 'মতুয়া' শব্দটি এসেছে 'মত্ততা' বা 'মাতোয়ার' শব্দ থেকে। অর্থাৎ নাম-সংকীর্তনের মত্ত থাকার কারণে 'মতো' শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রাম্য ভাষায় ব্যঙ্গার্থে 'মতো' শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল তবুও এই হরিনাম সংকীর্তন এ মাতোয়ারা বা মত্ততা তাদের আছে 'সমাধির নামান্তর'। হরির নামে, কীর্তনে মেতে থাকা ভাববাদী-ভক্তিবাদী মানুষগুলি যারা বেদবিধি বা ব্রাহ্মণদের ধর্মগুরু হিসাবে মান্য না করে, শুধুমাত্র হরিনাম ও ভক্তিপ্রেমের মধ্যে সমস্ত রকম আধ্যাত্মিক ও জাগতিক আনন্দ খুঁজে পায় তারাই 'মতুয়া'। মাতোয়ারা মনে করে জাতিবাদে বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব কেউই স্বার্থশূন্য নয়, জাতিভেদহীন 'হরিনাম সংকীর্তনকারী' একমাত্র মতুয়া ভক্তগণই স্বার্থশূন্য হয়, নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে জীবনের আনন্দ খুঁজে পাওয়া ও আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবারণ করা যায়, সেই অধিকার মতুয়াদের বর্তমান।

> "সুতরাং হরিনাম সংকীর্তনকারী একটি ভক্তিবাদী সম্প্রদায় হলো 'মতুয়া সম্প্রদায়'।"[২২]

উনিশ শতকীয় প্রেক্ষাপটে মতুয়া ভক্তগণের ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক অবস্থানে পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে বিভিন্ন মতুয়া সাহিত্যিক, কবি, সঙ্গীতকার এবং প্রাবন্ধিকেরা মতুয়া ভক্ত সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। হরিনাম সংকীর্তনের সময় মতুয়া ভক্তগণ নিজেদের আত্মপরিচয়, সংসার চিন্তা ভুলে এক ভাবময় জগতে লীন হয়ে যায়।

> "অর্থাৎ হৃদয়ের প্রেম ও ভক্তিভাব যাদের মাতিয়ে তোলে, একান্তই ভুলিয়ে দেয় মানুষের জাতিগত, কুলগত ও বর্ণগত বৃত্তি ও বিশ্বাসগত সমস্ত বিভেদ ও বিরোধ, তারাই সত্যিকার অর্থেই 'মতুয়া'।"[২৩]

মতুয়া সাহিত্যিক কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের মতে 'নামে প্রেমে মাতোয়ারা মতুয়া এবং প্রচলিত ধ্যান-ধারণায় যাদের বিশ্বাস নেই, কিংবা চলতি প্রথায় বিদ্রোহী যারা তাঁরাই মতুয়া'। সুতরাং মতুয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে ভক্তগণ নামে প্রেমে মত্ত থাকলেও তাদের মধ্যে প্রথাগত ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যবাদী প্রাচীন সামাজিক রীতি-নীতির প্রতি বিরোধ প্রকাশ পেয়েছে।

> "মতুয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ভক্তি, বিশ্বাস ও চেতনা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যেখানে জাতিভেদ, কুলভেদ ও বর্ণভেদ থাকে না অর্থাৎ ভক্তি প্রেম ও নামের গুণে সকল মতুয়াগণ একই মঞ্চে অবস্থান করে।"[২৪]

'মতুয়া' শব্দ বা নামের উৎপত্তি যেভাবেই হোক না কেন মতুয়া নামের মধ্যেই এই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আদর্শ বা সাধন দর্শনের স্বরূপ পাওয়া যায়। নামসংকীর্তন ও সংঘ চেতনা একদিকে আধ্যাত্মিক ভাবের অনুসন্ধান দেয়, অন্যদিকে প্রথাগত অবস্থার প্রতি অন্তর্নিহিতি প্রতিবাদ জানায়।

মূলধারার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক অনুশাসন, শাস্ত্রীয় রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার ও যাগযজ্ঞ পরিহার করে রাধাকৃষ্ণের প্রতি প্রেমভক্তি, সংকীর্তন ও নগরকীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে আধ্যাত্মিক স্তরে পৌঁছানোর তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিল। মতুয়া ধর্মে সমস্ত রকম জাতিবাদকে অস্বীকার করে সমস্ত বর্ণের মানুষকে ধর্ম ও সামাজিক দৃষ্টিকোণে সমমর্যাদার আসনে বসানো হয়েছে।

> "গুরুচাঁদের সম-সাময়িককালে খুলনার তিনকড়ি মিঞা মতুয়া ধর্মের প্রবাদপুরুষ ও ধর্মপ্রচারক ছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর দৌহিত্র জলিলউদ্দিন মিঞা মতুয়া দলপতি হয়েছিলেন।"[২৫]

বৈষ্ণবধর্মের মতোই মতুয়া ধর্মমতে ভক্তগণ নাম-সংকীর্তনকে আধ্যাত্মিক সাধন মার্গের চরমপর্যায়ে বা 'সমাধি' স্তর হিসাবে মনে করে। চৈতন্যদেবের ভক্তিবাদী আন্দোলনে স্ত্রীলোকদের বিশিষ্ট স্থান ছিল, অদ্বৈত আচার্যের স্ত্রী সীতাদেবী, নিত্যানন্দের দ্বিতীয়া পত্নী জাহ্নবা দেবী ও শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরানী এবং পরবর্তীতে কালে উনিশ শতকে বৈষ্ণব নারীরা 'মা গোঁসাই' রূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মতুয়া ধর্মেও স্ত্রী জাতিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে- হরিচাঁদ পত্নী শান্তিদেবী, গুরুচাঁদ পত্নী সত্যভামা দেবী এবং প্রমথ রঞ্জন ঠাকুরের স্ত্রী বিনাপাণি দেবী (বড়মা) এমন কি বর্তমানে বহু মতুয়া নাম-সংকীর্তন দলের প্রধান হিসেবে স্ত্রীলোকদের বিশিষ্ট ভূমিকা দেখা যায়। বৈষ্ণব ধর্ম আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যেমন বৈষ্ণব সাহিত্য-সংস্কৃতির জন্ম হয়েছিল, তেমনি মতুয়া ধর্ম আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বহু সাহিত্য-কাব্য-সঙ্গীত-সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছিল।

বৈষ্ণব ধর্মীয় আন্দোলন ধর্মীয় দিক দিয়ে বা আধ্যাত্মিক পর্যায়ে সমস্ত বর্ণের মানুষকে এক আসনে অধিষ্ঠান করলেও সামাজিক দিক দিয়ে তার পরবর্তী শিষ্যগণ তেমন কোনো সমাজ সংস্কারমূলক কাজে মনোনিবেশ করেননি। কিন্তু মতুয়া ধর্মের ক্ষেত্রে ধর্মীয় সাম্য প্রচারের সাথে সাথে সামাজিক সাম্য, শিক্ষা বিস্তার, এমনকি নিজস্ব সম্প্রদায়ের অর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ও রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশের চেষ্টা দেখা যায়। চৈতন্যদেব সনাতন সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন চাননি। মতুয়া ধর্ম আন্দোলনের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক পুরোহিতদের প্রভুত্ব বা আধিপত্যের বিনাশ সাধন করতে সচেষ্ট হয়। চৈতন্যদেব ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান ছিলেন, তাঁর প্রথম স্ত্রী লক্ষীদেবীর মৃত্যুর পরে বিষ্ণুপ্রিয়া নামে ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করেন। পিতার শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন করতে ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক রীতিতে 'গয়ায় পিন্ডদান' করেন এবং ১৫১০ সালে কেশব ভারতীর কাছে দীক্ষা ও সন্ন্যাস গ্রহণ করে সংসার ত্যাগ করেন।

> "মতুয়া ধর্মের শ্রাদ্ধ পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করলেও ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের আবশ্যিকতা পরিহার করা হয়। মতুয়া ধর্মে 'দীক্ষা গ্রহণ' এবং 'গুরুবাদ'কে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা হয়েছে। মতুয়ারা সন্ন্যাস গ্রহণেও বিশ্বাসী নয়, 'গার্হস্থ্য প্রশস্ত' ধর্মই তাদের ধর্মীয় ভিত্তি।"[২৬]

চৈতন্য পরবর্তী কালে উনিশ শতকে মূলধারার গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনে দীক্ষা গ্রহণকে কেন্দ্র করে 'জাতবৈষ্ণব' গুরুদের ও ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বৈষম্য, মন্ত্রতন্ত্র ও ব্রাহ্মণবাদের প্রভাবে 'ভক্তি ও প্রেমের' উত্তরাধিকারীর অভাবে সার্বজনীনতা হারিয়ে ক্রমশ শুকিয়ে যাওয়া নদী স্রোতে পরিণত হয়। মতুয়া ধর্ম আন্দোলন সঠিক উত্তরাধিকারী হিসাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আত্মপ্রকাশ করে, প্রেমভক্তিকে সঙ্গী করে, গুরুবাদকে অস্বীকার করে ধর্মীয় সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করে। এমনকি রাজনৈতিক অন্তর্গঠনের চেষ্টায় দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষিত হয়- 'যার দল নেই তাঁর বল নেই' সমাজের সম্মানজনক স্থানে অধিষ্ঠানের জন্য 'শিক্ষাকে ধর্ম রূপেই' স্বীকৃতি দেয়। মতুয়া আন্দোলন এখানে বৈষ্ণব আন্দোলনের থেকে অনেকাংশে বেশি প্রগতিশীলতাকে গ্রহণ করেছে। কালের আবর্তে বহু প্রকারের শাখা উপ-শাখায় বিভক্ত হয়ে, হিন্দু সংস্কৃতির এক একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে এক এক প্রকার মূর্তি ধারণ করল।

মূল ধারার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অনুসারী বাউল সম্প্রদায়ের সঙ্গেও বৈষ্ণবদের তুলনামূলক সম্পর্ক বিদ্যমান। বাউল সম্প্রদায়ের সাধকগণের মধ্যে প্রাণপুরুষ ছিলেন লালন ফকির। ভক্তিসংগীত ও মানুষের ভালোবাসা- প্রেমের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করার পথই বাউলদের আধ্যাত্মিকতার মূলকথা। বাউল সাধকগণ বৈদিক যুগের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি, জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতা বিরোধী একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়। বাউল সম্প্রদায় ঈশ্বরের অলৌকিক অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। মানুষের মধ্যেই এরা 'মনের মানুষকে' খুঁজে বেড়ায়। বাউল গান প্রেম বিহ্বল, আত্মহারা উন্মত্ত সাধক। সমন্বয়বাদী মানবধর্মে বিশ্বাসী এক ধরনের সামাজিক সংঘাত এই বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে লক্ষ্যণয়, যা নিম্নবর্গের

চেতনাজাত। লোকসংস্কৃতি ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতায় একই সামাজিক ভাবনায় মতুয়া ধর্মের ক্ষেত্রে বাউল সংগীতের মতো 'মতুয়া সংগীতের' মাধ্যমে নিম্নবর্ণের প্রান্তিক মানুষের মধ্যে উদার চেতনা বৃদ্ধি ও সমন্বয়বাদী সংস্কৃতির বার্তা প্রচার করে। মতুয়া ধর্মের ক্ষেত্রে বাউলদের মতো জাতিভেদ, পৌত্তলিকতা পরিহার করে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করে।

> "মতুয়া ধর্ম বিশ্বাস করে 'যে যারে উদ্ধার করে, সেই তাঁর ভগবান'।"[২৭]

বাউল সাধকদের মতো মতুয়া ধর্মপ্রচারক গোঁসাই, পাগলগণ মানবপ্রেম, ভক্তি সাধনার অঙ্গ হিসাবে হরি-সঙ্গীত, মতুয়া সংগীত ও নাম-সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করে।

> "অশ্বিনী গোঁসাই, বিচরণ পাগল প্রমুখ মতুয়া সাধক ছিলেন একদিকে মতুয়া সংগীতকার, অন্যদিকে মতুয়া ধর্ম-সমাজ-সংস্কারক।"[২৮]

বাউল সম্প্রদায়ের সঙ্গে মতুয়া সম্প্রদায়ের পার্থক্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- বাউল সম্প্রদায় গুরু-গুরুবাদে বিশ্বাসী। বাউল গুরুদের মধ্যে সিরাজশাহ, মাণিকশাহ, শীতল, খোদাবক্স প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ছিলেন। বাউলদের মতো দীক্ষাদান, শিষ্য তৈরি মতুয়া ধর্মে পরিত্যক্ত, মতুয়া ধর্মের ধর্ম প্রচারকগণ দীক্ষাদান ও গুরুশিষ্য সম্পর্ক তৈরি করেন না। বাউলদের সাধনা নারীকে নিয়ে কিন্তু তারা প্রকৃত অর্থে সংসার জীবনে বিশ্বাসী নয়। নারীরা বাউলদের সাধনসঙ্গিনী, তাদের শিষ্যগণ, সেবাদাসী, চরণদাসী প্রভৃতি নামে তাদের সাধনায় অংশগ্রহণ করেন, অথচ বাউলদের কাছে নারীগণ ব্রাত্য। বাউলগণ নারীদের সঙ্গে দৈহিক মিলনের মাধ্যমে চরম আধ্যাত্মিক পর্যায়ে উপনীত হওয়ার তত্ত্ববিলাসে বিশ্বাসী কিন্তু নারীদের রিক্তত্ব, শূন্যতা ও অসহায়তা এবং আত্মমর্যাদাহীন প্রাণীর বিষয়ে তারা অসচেতন। গার্হস্থ্য ধর্ম ও নারীর প্রশ্নে মতুয়া ধর্মের অবস্থান বাউল সম্প্রদের ঠিক বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে। কেননা মতুয়াগণ 'প্রশস্ত গার্হস্থ' ধর্মে বিশ্বাসী সংসারে নারী-পুরুষ সমান অংশীদারী, পরস্ত্রী মতুয়া ধর্মে মাতৃসম, পুরুষের এক নারীই 'ব্রহ্মচারীর' সমান। অর্থাৎ মতুয়া ধর্মে নারীরা অসহায় নয়, বরং আত্মমর্যাদা সম্পন্ন, তারা স্বামী-সন্তান-সন্ততি সবাইকে নিয়ে শান্তিতে সংসার ধর্ম পালনের সঙ্গে সঙ্গে হরিনাম সংকীর্তনে পুরুষের সঙ্গে একই সঙ্গে অংশগ্রহণ ও আধ্যাত্মিক চেতনা লাভ করতে পারে। মতুয়াগণ বাউলদের মতো নারীদের 'দেহ-সাধনসঙ্গিনী' হিসাবে দেখে না বা দেহতত্ত্বে বিশ্বাস করে না।

উনিশ শতকে উদ্ভূত ব্রাহ্ম আন্দোলনের সঙ্গেও মতুয়া ধর্মের একটি তুলনামূলক সম্পর্ক ছিল। বিভিন্ন সময়ে ভক্তি ও প্রেম মানবতাবাদী ভাবধারা নিয়ে যে সমস্ত সংস্কারক তাঁদের নিরলস কর্মে লিপ্ত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য- শ্রীচৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ, রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ। উচ্চবর্ণের সমাজ থেকেই এসেছেন এঁরা সকলেই প্রায়। তাঁদের মানবতাবাদী ভাবধারা, সর্ববর্ণের সমন্বয়বাদ, শাস্ত্র কাঠামোর মূল্যবোধের দ্বারা বারবার আক্রান্ত, বাঁধাপ্রাপ্ত ও দ্বিধা বিভক্ত হয়েছে। সমাজের উচ্চশ্রেণিতে অবস্থানজনিত কারণে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের ধর্মীয় সমাজ সংক্রান্ত মানসিক সংকটের অবস্থা তাঁরা যেমন অনুধাবন করতে পারেননি, তেমনি সমাজের নিচুতলার মানুষও তাঁদের মানবতাবাদী আদর্শের সম্পদ ও সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত থেকেছেন। বাংলার এই বঞ্চিত মানুষের ধর্মীয় সামাজিক সংস্কারের ধারাটির উত্তরাধিকারী হিসাবে মতুয়া ধর্মের প্রবর্তক হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুর এবং তাঁদের অনুগামীরা সমাজের নিম্নশ্রেণির তথাকথিত চন্ডাল বা নমঃশূদ্র সম্প্রদায় থেকে উঠে এসেছেন। মতুয়া ধর্মীয় আন্দোলনের সূচনাতেই দুটি দিক এই আন্দোলনের স্বতন্ত্রতা দান করেছে। প্রথমত, গ্রাম-বাংলার নিম্নবর্ণের মানুষের ধর্মও সমাজকে কেন্দ্র করে এবং তাদের পাশে থেকে ধর্মীয় পরম্পরার মধ্যেই মতুয়া ধর্মের উদ্ভব হয়েছে ও ক্রমবিকাশ ঘটেছে। সবার নিচে, সবার পিছে, সর্বহারাদের মাঝে থেকে হরি-গুরুচাঁদ অভিনব ধর্মীয় মতাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয়ত, বাংলার ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্ম, বৈষ্ণব ভক্তিবাদ, চৈতন্য পরবর্তী সময় প্রাক-আধুনিক ঔপনিবেশিক পর্বে মূলধারার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিপরীতে গড়ে ওঠা বাউল, কর্তাভজা, বলাহাড়ি, সাহেবধনী, খুশিবিশ্বাসী, জগন্নমোহনী, সখীভাবক, সাঁই, দরবেশ প্রভৃতি সাম্প্রদায়গুলির ধর্মীয় বিশ্বাস, রীতিনীতি নির্মিত হয়েছে 'ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পরিপন্থী' দৈনন্দিন সাধারণ বোধের স্বতঃস্ফূর্ত উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করে।

> "এই স্বতঃস্ফূর্ত চেতনার উপাদানগুলি কখনো বিরোধী এবং কখনো কখনো উচ্চবর্ণের আভিজাত্য মূলক ধর্মসংস্কৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করলেও এদের ধর্ম ও সামাজিক চেতনার মধ্যেকার- ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের কর্তৃত্ব, বর্ণবাদের কৌলিন্য, পৌত্তলিকতার পৃষ্ঠপোষকতা প্রভৃতি আধিপত্যমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ নতুন নতুন চিন্তা পদ্ধতি জীবনধারার সঙ্গে তাদের সাধারণ বোধ এবং ধর্মবিশ্বাসকে পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত করেছিল।"[২৯]

যেগুলি 'নিম্নবর্গের চেতনা'র মতো নিম্নবর্ণের সমদর্শী চেতনা। মতুয়া ধর্মে আধিপত্যমূলক ধর্মীয় শাস্ত্র, বেদ, পুরাণ, স্মৃতি শাস্ত্রগুলিকে বর্জন করে নতুন মানবতাবাদী ভাবধারায় প্রথম অবস্থায় নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্থিত হলেও পরবর্তী পর্যায়ে সম্প্রদায়গত সীমারেখা অতিক্রম করার তাগিদে অন্যান্য নিম্নবর্ণের মানুষের ভিন্নতা, বিভেদ অতিক্রম করার জন্য উচ্চবর্ণের কর্তৃত্ববাদের দিকগুলি বর্জন এবং নিজেদের ধর্মীয় সামাজিক মর্যাদা হীনতাকে 'সমতার ভিত্তিভূমি' হিসাবে সমষ্টিগত চেতনায় আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ নির্মাণ করেছে।

> "এই 'সংস্কৃতায়ন পদ্ধতির' বিকল্প রূপে মতুয়া ধর্মান্দোলন স্থানীয় গণ্ডি অতিক্রম করে সমগ্র দলিত জনগণের নিকট জাতিবাদহীন সৌভাতৃত্বের আদর্শে ধর্ম, বর্ণহীন সকল জাতিকে একত্রিকরণের সার্বজনীন আদর্শে উপনীত হয়েছে।"[৩০]

আত্মপ্রতিষ্ঠার সন্ধানে মতুয়া ধর্ম ধর্মীয় ভাববাদের মধ্যে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক জাগরণের দিকগুলি সুচিন্তিতভাবে আয়ত্ত করেছে, ফলে সমসাময়িক ধর্মীয় আন্দোলনগুলি থেকে মতুয়া সম্প্রদায়কে স্বতন্ত্র হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। অর্থাৎ মতুয়া আন্দোলন একটি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন হলেও এরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বিশ্বাস করে। উনিশ শতকে এবং তার পূর্বে যতগুলো ধর্মের উদ্ভব ঘটেছে বাংলায়, তার মধ্যে একমাত্র মতুয়াবাদই সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পক্ষপাতী। এরা মনে করে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করলে রাষ্ট্রের কাছ থেকে তাদের প্রাপ্য চাহিদা তারা পূরণ করতে পারবে না। তাই সামাজিক আন্দোলনকে গতিশীল করতে গেলে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা অবশ্যম্ভাবী বলে তাদের মত। এবং এটা বর্তমানকালে পরীক্ষিত যে, একমাত্র পিছিয়ে পড়া নিম্নশ্রেণির প্রতিনিধি হিসাবে মতুয়া আন্দোলনই সার্থকভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ সদর্থক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে। যা ষোড়শ শতকে উদ্ভূত মূলধারার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম এবং উনিশ শতকের মূলধারার বাইরে গড়ে ওঠা বিভিন্ন বৈষ্ণব গোষ্ঠী বা তাদের শাখা-সম্প্রদায়ের পক্ষে করা সম্ভব হয়নি।

মতুয়া একটি নিছক ধর্ম সম্প্রদায় নয়, মতুয়া ধর্ম আন্দোলন লোকায়ত ভাবধারায় উদ্দীপ্ত বাংলা দলিত সমাজের নিপীড়িত জনজাতির আত্মজাগরণের আন্দোলন। বাংলা ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসে শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর ও মতুয়া ধর্ম আন্দোলন সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে মতুয়া ধর্ম সম্প্রদায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তা নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। উনিশ শতকে মতুয়া ধর্মাদর্শের নীতিসমূহ এবং কার্যধারা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে এই সত্য উপলব্ধি করা যায় যে, হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুর নির্দেশিত পথ জীবন ঘনিষ্ঠ ও সমাজ সচেতন মানসিকতারই প্রতীক এই কারণেই হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুর মতুয়াদের শুধু ধর্মাদর্শে আপ্লুত করেননি, নিপীড়িত মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ করেছেন গণচেতনায় ও সমাজ সংস্কারে প্রচেষ্টায়। মতুয়া ধর্ম আন্দোলনের পতাকাতলে হরি-গুরুর নেতৃত্বে প্রধানত নমঃশূদ্র সমাজকে অবলম্বন করে যে সমস্ত সংস্কার আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে তার মধ্যে জাতপাত বিরোধী অস্পৃশ্যতা বিমোচন, নমঃশূদ্র জাতির চণ্ডাল নাম মোচন, নারী জাগরণ, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতনতা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, স্বয়ংসশক্তি ও শক্তি সঞ্চয়, চারিত্রিক শুদ্ধতা রক্ষা, মিতব্যয়িতা, অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিরোধ, শিক্ষা বিস্তার, স্ব-জাতি রীতি ও দেশপ্রেম প্রভৃতি প্রধান। অনুন্নত সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন সাধনই ছিল হরিচাঁদের আদর্শ। হরিচাঁদ আদর্শে উদ্বুদ্ধ শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন অনুন্নত নমঃশূদ্র তাথার সমগ্র অবহেলিত দলিত সমাজের আত্মোনতি ও জাগরণের জন্য।

> "১২৮৭ বঙ্গাব্দে দত্তডাঙ্গা এবং ১৮৮১ সালে খুলনার সভায় গুরুচাঁদের নেতৃত্বে শুধু নমঃশূদ্র সমাজকে সংগ্রামে সংগটিত করেননি, ঐতিহাসিক অর্থে তা অবিলিত মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে আত্মজাগরণের পথে।"[৩১]

মতুয়া ধর্মান্দোলনের পতাকা তলে দত্তডাঙ্গায় যে গণ-সমাবেশ হয়েছিল, তা ছিল শ্রমজীবী-কৃষিজীবী নমঃশূদ্র সমাজ তথা শ্রেণি-বর্ণ-বিভক্ত সমাজের নিম্নস্তরের অবহেলিত মানুষের গণজাগরণের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। শিক্ষা-প্রসার সহ নানা প্রকার সমাজ সংস্কারমূলক কর্মধারার অগ্রগতির জন্য এবং অভিজাত, জমিদারতন্ত্র, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সফল হওয়ার জন্য অনেক ক্ষেত্রে যুগ সচেতন শ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুর ইংরেজ প্রশাসন বা 'রাজশক্তি ধারা'-র কৌশলগত পথ অবলম্বন করেছিলেন। আর্থ-সামাজিক অধিকার ও সামাজিক ধর্মীয় সংস্কার প্রচেষ্টাকে অগ্রাধিকার না দিয়ে, তদানিন্তন স্বদেশি আন্দোলনে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের যে লড়াই, গুরুচাঁদ ঠাকুর খুব স্বাভাবিক কারণেই তা সহজ ভাবে গ্রহন করতে পারেননি। সর্বপ্রকার সামাজিক নিপীড়ন ও বঞ্চনার মূল উৎপাটন না করে যে রাজনৈতিক আন্দোলন সার্থক হতে পারে না- এই সত্যই বিশেষভাবে ব্যক্ত করেছিলেন গুরুচাঁদ ঠাকুর তদানীন্তন বিদেশি বর্জনমূলক স্বদেশি আন্দোলনের পটভূমিকায়। অভিজাতক শ্রেণি পরিচালিত স্বদেশি আন্দোলনকে প্রকৃত জনমুখী করার জন্যই সম্ভবত গুরুচাঁদ ঠাকুর সামাজিক ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা দাবিতে সুদৃঢ় হয়েছিলেন। সুখের কথা আর্ত-মানবতার প্রতি গুরুচাঁদ ঠাকুরের এই সঠিক নেতৃত্বে যথাযোগ্য মূল্যায়ন ও মর্যাদা প্রদান করেছিলেন- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। পরবর্তীকালে গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে স্বদেশি আন্দোলনে নমঃশূদ্র সমাজের সক্রিয় ও সগৌরব অংশগ্রহণের ঐতিহাসিক স্বীকৃতি- গুরুচাঁদের তিরোধানে অনুষ্ঠিত কলকাতা এলবার্ট হলের মহাসভা, যেখানে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, জে. সি. গুপ্ত প্রমুখ সমবেত হয়েছিলেন ১৯৩৮ সালে এবং মতুয়া আন্দোলনের মহানায়কের অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন অকুণ্ঠিত ভাষায়।

> "ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে, নীল বিদ্রোহে, ভূ-স্বামীত্ব ও জমিদারতন্ত্রের বিরোধী কৃষক সংগ্রামে, স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং শ্রেণি সচেতন কৃষকের তেভাগা আন্দোলনের সক্রিয় অংশগ্রহণ করে নমঃশূদ্র পূর্বাপর তাদের সংগ্রামী ঐতিহ্যের উজ্জ্বল পরিচয় দিয়েছিলেন।"[৩২]

নমঃশূদ্র সমাজের এই বলিষ্ঠ সংগ্রামী ঐতিহ্য ও শ্রেণি সচেতনতা দেশ বিভাগোত্তর বাস্তহারা আন্দোলন, জাতীয়তাবাদী সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পটভূমিতে আজও সতত সক্রিয়। মতুয়া ধর্ম আন্দোলনের পতাকাতলে যে বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টা সংঘটিত হয়েছে, তার গতিপ্রকৃতি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, প্রবর্তক কেন্দ্রিক হলেও মতুয়াধর্ম সংকীর্ণ ধর্মগোষ্ঠীমাত্র নয়, তা ছিল পারিপার্শ্বিকের প্রতিক্রিয়াজাত সুসমৃদ্ধ জীবনবাদী বিশিষ্ট ধর্ম সম্প্রদায়। অপরদিকে মূলধারার গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সঙ্গে এদের উনিশ শতকে তেমন কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান ছিল না। আবার এটাও দেখা যায় যে, মূলধারার বাইরে গড়ে ওঠা ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধর্মসম্প্রদায়গুলি প্রতিযোগিতায়, তত্ত্বদর্শনে এবং সমাজ বিপ্লবের ক্ষেত্রে মতুয়াদের মতো ততটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি নিম্নবর্ণের মানুষদের মধ্যে। এখানে আবার, মূলধর্মের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের সঙ্গে প্রতিষ্ঠান বিরোধী, ব্রাহ্মণ্যবিরোধী, সহজিয়া মতবাদে বিশ্বাসী ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলির সঙ্গে বৃহৎ গোষ্ঠী হিসাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

মতুয়া ধর্মান্দোলনের বহুমুখী কর্ম প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসেবে সাংস্কৃতিক সৃজনশীলতার বিকাশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মূলধারার গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম যেমন সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল, ঠিক তার চেয়েও বোধহয় বেশি প্রভাব ফেলেছিল মতুয়া সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। মতুয়া ধারায় রচিত হয়েছে- জীবনীগ্রন্থ, নাটক, পালাগান, সাধনসংগীত, কাব্যতত্ত্ব ও কাব্যগ্রন্থ প্রভৃতি সাহিত্য নিদর্শন। মতুয়া ধর্ম আন্দোলন ও সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশিত হয়েছে নানাবিদ পত্রপত্রিকা বা সাময়িকপত্র। বলিষ্ঠ হরিনাম কীর্তন, উদন্ত হরিনাম, জয়ডংকা সহকারে নৃত্য, কাঁসরের মাদল, উচ্চস্বরে হরিবোল ধ্বনি উচ্চারণ, নৃত্য করতে করতে মাতাম, সংজ্ঞাহীন হয়ে যাওয়া- সমবেতভাবে নৃত্যগীত, অষ্টক গান, পালাগান, হরিযাত্রা ও নাটক প্রভৃতির প্রচলন নমঃশূদ্র সমাজে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। এর সঙ্গে দারুতক্ষণ শিল্প, গৃহস্থাপত্য, মন্দির, সুচিশিল্প, মিষ্টান্নশিল্প প্রভৃতি এই সমাজের বিশিষ্ট সম্পদ। মতুয়া নমঃশূদ্র সমাজের শাস্ত্রজ্ঞ ও সুউন্নত কবিগণ আজও বাংলার শিল্প-সুষমামন্ডিত কবিগানের তথা কবির লড়াইয়ের লৌকিক ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করে রেখেছেন, যা সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতাজাত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কবিওয়ালা' সংক্রান্ত আলোচনার বিভ্রান্তিকে দূর করতে সহায়তা করে।

"এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে বলা যায় যে, হরিচরণ আচার্য কবিগানের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদান রাখলেও, পূর্ববঙ্গে কবিগানের বিশিষ্ট রূপকার ও নব্যধারার প্রবর্তক ছিলেন মতুয়াচার্য 'কবিরসরাজ' তারকচন্দ্র সরকার।"[৩৩]

উনিশ শতকের প্রেক্ষিতে, সামগ্রিক বিচারে বলা যায় মতুয়া আন্দোলন একদিকে যেমন জাতপাত বিরোধী ধর্মীয় আন্দোলন, অন্যদিকে তেমন নমঃশূদ্র সমাজ তথা নিম্ন সম্প্রদায়ের মানুষের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক-সংস্কৃতিক আত্ম-জাগরণের আন্দোলন। শ্রীহরিচাঁদ প্রবর্তিত এবং শ্রীগুরুচাঁদ সংঘটিত মতুয়া ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলনের অভিঘাতে নিম্নসমাজের মানুষ যেমন আত্ম-সচেতন হয়ে উঠেছিল, তেমনি হরি-গুরুচাঁদের মধ্যে সকলে উপলব্ধি করেছিল এক অলৌকিক ঐশ্বরিক গরিমা ও মনুষ্যত্বের অপূর্ব মহিমা। তাঁরা শুধু পরম পুরুষ ছিলেন না, ছিলেন সার্থক যুগপুরুষ। তাই আধ্যাত্মসাধনার সীমা উত্তীর্ণ হয়ে তাঁরা তৎকালীন সমাজের আর্থসামাজিক দ্বন্দ্বের দিকেও দৃষ্টি নিয়োগ করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ভক্তিধর্ম ও সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে নমঃশূদ্র সমাজে তথা দলিত-শোষিত জনসমাজে সর্বতোমুখী গতিশীলতা সঞ্চারে সক্ষম হয়েছিলেন। এইভাবে হরি-গুরু চাঁদের ধর্মসাধনা ও কর্মপ্রয়াস সৃষ্টি করেছিল লোকায়ত সমাজের নবজাগরণ। আর এই জিনিসটি মূলধারার প্রাতিষ্ঠানিক গৌড়ীয় সমাজ করতে পারেনি। তবে মূলধারার বাইরে গড়ে ওঠা অন্যান্য বৈষ্ণবীয় প্রতীক সর্বস্ব ধর্মগুলি এ বিষয়ে কিছুটা সফল হয়েছিল।

উনিশ শতকের নবজাগরণের ইতিহাসে শ্রীচৈতন্য প্রভাবিত ষোড়শ শতকের নবজাগরণের প্রসঙ্গ বহু আলোচিত ও চর্চিত বিষয়। ইতিহাসের বস্তুবাদী দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করলে মনে হয়- ষোড়শ শতক ও উনিশ শতকের বহু বিঘোষিত নবজাগরণ বহুলাংশে সীমাবদ্ধ। চৈতন্য প্রভাবিত সারস্বতকে নবজাগরণ শেষ পর্যন্ত শাস্ত্রপ্রভামন্ডিত ও মঠ-গোস্বামী প্রভাবিত প্রথাবদ্ধতায় অবরুদ্ধ হয়ে যায়। ষোড়শ শতকের শেষের দিকে এবং উনিশ শতকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উপধর্মগুলি উদ্ভূত হওয়ার আগে পর্যন্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের প্রধান অঙ্গ- গৌড়ীয় মঠ ও মন্দির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো এবং সেখানেও ব্রাহ্মণ্যপ্রধান মহান্ত, মঠাধ্যক্ষ এবং বাবাজিরা শাস্ত্র সম্মত ধর্ম পরিচালিত করত। এর ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম জটিল ও কঠোর হয়ে পড়ে। অর্থাৎ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে শ্রীচৈতন্যের মতো নিয়ন্ত্রিত সংস্থায় পরিণত পরবর্তীকালের কোনো বৈষ্ণব নেতা করতে পারেনি। সেজন্যই তারা সমাজের ক্ষুদ্র অংশ এবং নিম্নবর্ণ থেকে দূরে থাকে। পুনরায় তাদের আবার বৈষ্ণব সমর্থক ও ভক্তের সংখ্যা কমতে থাকে। বৈষ্ণব ধর্ম বিভাজিত হয়ে যায়। প্রায় শতাধিক লোকায়ত গৌণধর্মের উত্থান ঘটে। যারা গোটা উনিশ শতক ধরে দাপটের সঙ্গে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্ম প্রচার ও প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল।

"এক্ষেত্রে চৈতন্য প্রবর্তিত রেনেসাঁস ক্ষণস্থায়ী হয়ে পড়ে।"[৩৪]

সে ক্ষেত্রে বৈষ্ণব ধর্ম থেকে বেরিয়ে যাওয়া একটি নতুন মতবাদ 'মতুয়া মতবাদ' অল্পদিনের মধ্যেই উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার দ্বিতীয় এবং অন্যান্য ধর্মীয় শ্রেণির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বে পরিণত হয়। অর্থাৎ মাহিষ্যদের পরে নমঃশূদ্ররা জনসংখ্যার নিরিখে এবং শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে তারা অন্যান্য প্রায় সকল ধর্মবর্ণের থেকে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে অবশ্যই উনিশ শতকে নবজাগরণের প্রেক্ষাপটটি মতুয়া আন্দোলনের ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করেছিল। অপরদিকে মূলধারার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রতিযোগিতায় অনেকটাই পিছিয়ে পড়ে শুধুমাত্র তাদের রক্ষণশীল নীতির জন্য। এরফলে বাংলার অজস্র মানুষের সমর্থন তারা হারাতে বসে, যদিও ইতিপূর্বে সহজিয়া ও জাতবৈষ্ণব ধর্ম সংক্রান্ত মতভেদকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণবদের সঙ্গে অন্যান্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরোধ ও মতান্তর তৈরি হয়। সে কারণে জাতবৈষ্ণবদের নিচ দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা হতো। সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সামগ্রিকভাবে যা করতে পারেনি, মতুয়া সহ অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়গুলি অনেকাংশে তা করতে সক্ষম হয়েছিল। বিপরীতক্রমে উনিশ শতকের নবজাগরণ মূলত: বহিরাগত পাশ্চাত্য প্রভাবজাত জাগরণ এবং মুখ্যত: কলকাতা কেন্দ্রিক উচ্চসমাজ ও 'এলিট' বা সুবিধাভোগী শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। উনিশ শতকের নবজাগরণ ও জাতীয় আন্দোলনের প্রভাব সেকালে প্রধানত সমাজের উচ্চস্তরে সীমাবদ্ধ ছিল, সেই সময়ের নিপীড়িত নমঃশূদ্র সমাজের নবজাগরণ সুনির্দিষ্ট রূপলাভ করেছিল হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে। মতুয়াদের কর্মপ্রচেষ্টা কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িক ধর্মক্রিয়া নয়, বরং তা বিশেষ অর্থে সমাজে নিম্নস্তরের অবহেলিত মানুষের গণজাগরণের দিশারী। হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ প্রবর্তিত নবজাগরণ বাংলার জলবায়ুসম্ভূত সাধারণ মানুষের জাগরণ এবং সম্পূর্ণ

স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এই জাগরণের প্রভাবে বাঙালির নিজস্ব ঐতিহ্যজাত লোকায়ত চরিত্রের বিকাশ ঘটেছে স্বকীয় ধারায়। মতুয়া ভাবধারা শুধু ভক্তমন্ডলী ও নমঃশূদ্র সমাজের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকেনি, তা ক্রমব্যাপ্ত হয়েছে লোকায়ত জনসমাজের বৃহত্তর পরিধিতে এবং নিম্ন সমাজের মানুষ এই আন্দোলনের মাধ্যমে লাভ করেছে নতুন জীবনবোধ।

> "যে অর্থে শ্রীচৈতন্যদেবকে ষোড়শ শতকের নবজাগরণের নেতা বা রাজা রামমোহন রায়কে উনিশ শতকের নবজাগরণের নেতা বলে অভিহিত করা হয়, সেই অর্থে শ্রীহরিচাঁদ ও শ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুরকে বাংলার অবহেলিত লোকায়ত সমাজের নবজাগরণের যথার্থ অগ্রদূত বলা ছিলেন।"[৩৫]

তাই উনিশ শতকের প্রেক্ষিতটি স্মরণে রেখে বলা যায় যে, জাতপাত বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে যার প্রাথমিক সূত্রপাত, ধর্ম সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে তা আর্থ-রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয় এবং সৃষ্টি করে নিম্ন সমাজের পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন। এইভাবে মতুয়া ধর্ম আন্দোলন মূলত: নমঃশূদ্র সমাজকে অবলম্বন করে উদ্ভূত হলেও কালক্রমে তা সমাজ সংস্কার ও স্বদেশি আন্দোলনের মধ্য দিয়েও জাতীয় জাগরণের সার্থক পরিণতির দিকে অগ্রসর হয় এবং সামগ্রিকভাবে সৃষ্টি করে নিম্ন সমাজের নবজাগরণ। সামগ্রিক বিচারে পূর্বাপর মতুয়া ধর্ম আন্দোলনের ইতিহাস বিশ্লেষণে এই সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয় যে- মতুয়া ধর্ম নিতান্ত ব্রাহ্মণ্যবাদ বা পুরোহিততন্ত্র বিরোধী ধর্মযুদ্ধ নয়, তা দলিত, নিপীড়িত নিম্নবর্ণ ও সর্বহারা শ্রেণির মানুষের আত্মজাগরণের আন্দোলনের সার্থক পরিণতি। মতুয়া আন্দোলন বঙ্গভূমির জনজাতির প্রবাহ ও আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে উদ্ভূত লোকায়ত জীবনাশ্রয়ী বৃহৎ ঐতিহ্য ও ক্ষুদ্র ঐতিহ্যের প্রক্রিয়াজাত ও বিশিষ্ট ধর্ম, যার মধ্যে যুগবাস্তবতার পটভূমিতে ব্যর্থ হয়ে আছে জাগ্রত মানবধর্মের মহান উত্তরাধিকার।

> "শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর ও শ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুরের আরব্ধ সাধনকর্ম আজ অবধি সমাপ্ত হয়নি, তার প্রবাহিত হয়ে চলেছে মতুয়া ধর্ম আন্দোলনের বহুমুখী ধারা এবং স্বীয় প্রাণশক্তির স্বকীয়তায় বঙ্গ-ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে সৃষ্টি করে চলেছে নিত্য নতুন অধ্যায়।"[৩৬]

তাই দেখা যায় যে, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বাংলার মতুয়া আন্দোলনের ক্ষেত্রে মূলধারার প্রাতিষ্ঠানিক গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব পড়েছিল অবিসংবাদিতভাবে। বিভিন্ন ঘাট প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ধারাবাহিকভাবে মতুয়া ধর্মের উত্তরণের ক্ষেত্রে বৈষ্ণব ধর্মের জাতপাতহীন আদর্শ নতুন মোড়কে দেখা গিয়েছিল নমঃশূদ্রদের নেতৃত্বে মতুয়া ধর্ম আন্দোলনে। এর ফলে বাংলার আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে নতুনভাবে জাগ্রত করেছিল মতুয়া ধর্মের উদ্ভব জনিত ফলশ্রুতিতে। সুতরাং এ কথা বলাই যেতে পারে যে, প্রাক-স্বাধীনতা পর্বের অবিভক্ত বাংলা এবং পরবর্তীকালে স্বাধীনোত্তর বাংলার আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় এমনকি রাজনৈতিক ক্ষেত্রকেও প্রভূত পরিমাণে মতুয়া আন্দোলন প্রভাবিত করেছিল, যা ছিল প্রকৃতপক্ষে চৈতন্য পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ধর্মের জাতিবাদহীন ধর্মান্দোলনের ফসল।

তথ্যসূত্র :

১. Malley, L.S.S.O', Bengal District Gazetteers, Jessore, Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1912, p. 191-192

২. বিশ্বাস, মনোশান্ত, বাংলার মতুয়া আন্দোলন: সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি, সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, ১ম সং, মে, ২০১৬, পৃ. ৩১

৩. Risley, H.H, The Tribes and Castes of Bengal, Vol.I, London, Reprint, Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1881, pp.186-188; Gait, E.A, Census of India, Bengal, Part-I, Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1901, p. 395

৪. বিশ্বাস, শশীকুমার, নমঃশূদ্র দ্বিজতত্ত্ব, বরিশাল, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৯৫-৯৬

৫. রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদিপর্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১ম সং, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, সাক্ষরতা সং, ১৪০০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৭৭

৬. তরফদার, মমতাজুর রহমান, হোসেনশাহী আমলে বাংলা ১৪৯৪-১৫৩৮: একটি সামাজিক রাজনৈতিক পর্যালোচনা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৪৮-১৪৯
৭. বিশ্বাস, মনোশান্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, পলাশি থেকে পার্টিশন ও তারপর, আধুনিক ভারতের ইতিহাস, অনু., কৃষ্ণেন্দু রায়, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, হায়দ্রাবাদ, ১ম প্রকাশ, ২০০৬, পৃ. ৪১৯-৪২০
৯. Bandyopadhyay, Sekhar, Caste, Politics and the Raj: Bengal 1872-1937, K.P. Bagchi & Company, Calcutta, 1990, pp. 143-146
১০. চক্রবর্তী, রমাকান্ত, চৈতন্যের ধর্মান্দোলন : মূল্যায়ন, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ২-৫
১১. ঐ, বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ৫ম মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ১১১-১১২
১২. Bandyopadhyay, Sekhar, Caste, Protest and Identity in Colonial India: The Namasudras of Bengal, 1872-1947, Richmond, Surrey:Curzon Press, 1997a, pp. 139-141
১৩. চক্রবর্তী, রমাকান্ত, বাঙালির ধর্ম সমাজ ও সংস্কৃতি, সুবর্ণরেখা পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ২০০২, পৃ. ৯৭-৯৮
১৪. বিশ্বাস, মনোশান্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭
১৫. বিশ্বাস, প্রমোদবরণ, বাংলার অস্পৃশ্যতা: জলচল প্রথা ও রাজনীতি, চিত্ত মন্ডল, প্রথমা রায় মন্ডল (সম্পা.), বাংলার দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত, অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৪০০-৪০১
১৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, দাশগুপ্ত, অভিজিৎ (সম্পা.), জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিস, নতুন দিল্লি, ১৯৯৮, পৃ. ৮৩-৮৪
১৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, পলাশি থেকে পার্টিশান আধুনিক ভারতের ইতিহাস, অনু., কৃষ্ণেন্দু রায়, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ২০০৬, পুর্নমুদ্রণ, ২০১২, পৃ. ৪১৭
১৮. বিশ্বাস, মনোশান্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯
১৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩
২০. গোঁসাই, তারক সরকার, শ্রীশ্রীহরিরামৃত, ওড়াকান্দি ঠাকুরবাড়ি, প্রকাশনা দপ্তর: ওড়াকান্দি, বাংলাদেশ, ১ম সং, ১৩২৩, পুনর্মুদ্রণ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ, উল্লেখিত বংশলতা, পৃ. ১৩-১৪
২১. Bandyopadhyay, Sekhar, Mobilizing for a Homeland: Dalits, Nationalism and Partition in Bengal (1947), In The Unfinished Agenda: Nation-Building in South Asia, M. Hasan and N. Nakazato(Ed.), Manohar, New Delhi, 2001, pp. 151-195
২২. বিশ্বাস, মনোশান্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১
২৩. ভট্টাচার্য, শিবপ্রসাদ, শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত, মতুয়া প্রচার সংঘের স্মরণিকা, চাঁদপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, ১৯৮১, পৃ. ভূমিকাংসে উল্লেখিত।
২৪. ঠাকুর, কপিলকৃষ্ণ (সম্পা.), গুরুচাঁদ ও অন্ত্যজ বাংলা নবজাগরণ, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ.১
২৫. তদেব, পৃ. ৬৪
২৬. ঝা, শক্তিনাথ, বস্তুবাদী বাউল: উদ্ভব ও বিকাশ, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১ম সং, ১৯৯৯, ১ম দে'জ সং, ২০১০, পৃ. ১২০
২৭. ঠাকুর, কপিলকৃষ্ণ (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১
২৮. বিশ্বাস, মনোশান্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩-৪৪

২৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, ও দাশগুপ্ত, অভিজিৎ (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩
৩০. Srinivas, M.N, Social Change in Modern India, Orient Longman, California, 1972, pp. 6-7
৩১. নন্দী, রতনকুমার, বিষয়: লোকসংস্কৃতি, সাহিত্যশ্রী প্রকাশনী, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, জুলাই, ২০১৭, পৃ. ২১২
৩২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৯-৫১০
৩৩. নন্দী, রতনকুমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪
৩৪. তদেব, পৃ. ২১৫
৩৫. বৈরাগ্য, বিরাটকুমার(সম্পা.), মতুয়া-স্মরণিকা, ডিসেম্বর, ১৯৯৩
৩৬. ঠাকুর, কপিলকৃষ্ণ (সম্পা.), প্রাগুক্ত